বাংলাদেশের জাতিগোষ্ঠী

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও আদমশুমারি

কোন দেশের জনসংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে গণনা করার পদ্ধতিকে আদমশুমারি বলে। বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো' আদমশুমারি পরিচালনা করে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে; ১৯৭৪ সালে, ১৯৮১ সালে, ১৯৯১ সালে, ২০০১ সালে এবং সর্বশেষ ২০১১ সালে। বাংলাদেশে প্রতি ১০ বছর অন্তর আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। ২০২১ সালে পরবর্তী আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হবে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৫.১৭ কোটি । জনসংখ্যায় সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান— তৃতীয়; মুসলিম বিশ্বে— চতুর্থ; এশিয়ায়— পঞ্চম । ২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয় ।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুসারে -

মোট জনসংখ্যা	১৬.৬৫ কোটি
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩৭%
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১১২৫ জন
পুরুষ : নারী	১০০.২ : ১০০
গড় আয়ু	৭২.৬ বছর
পুরুষ ও মহিলা গড় আয়ু	৭১.১ বছর ও ৭৪.২ বছর
প্রতি হাজারে স্থুল জন্মহার	১৮.১ জন

প্রতি হাজারে স্থুল মৃত্যুহার	৪.৯ জন
প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার (১ বছরের নিচে জীবিত জনে)	২১ জন
১৭২৪ জন মানুষে	১ জন চিকিৎসক
দারিদ্র্যের হার	২০.৫%
চরম দারিদ্র্যের হার	১০.৫%
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	৫.২৪%
মাথাপিছু আয়	২০৬৪ মার্কিন ডলার
মাথাপিছু জিডিপি	১৯৭০ মার্কিন ডলার
সুপেয় পানি গ্রহণকারী	৯৮.১%
সাক্ষরতার হার (৭ বছর +)	৭৪.৪%
রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান	নবম
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পায়	সৌদি আরব থেকে
কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির	৪০.৬%
শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির	২০.৪%
সেবাখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির	৩৯%

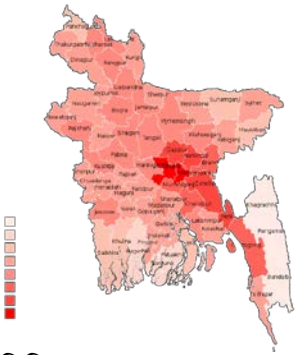

বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব (সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)

বাংলাদেশে ঢাকা জেলায় সবচেয়ে বেশি ও বান্দরবান জেলায় সবচেয়ে কম মানুষ বাস করে । ঢাকা বাংলাদেশের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ জেলা এবং বান্দরবান সর্বনিম্ন ঘনবসতিপুর্ণ জেলা । বিভাগ হিসেবে সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস করে ঢাকা বিভাগে এবং সবচেয়ে কম মানুষ বাস করে বরিশাল বিভাগে । সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি বরিশাল বিভাগে ও সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগে । NIPORT- National Institute of Population Research and Training হলো বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৭৭ সালে আজিমপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় । এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা । বাংলাদেশে চাকুরীজীবী মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করা হয়েছে। বাংলাদেশের কোন পুরুষ নাগরিক বিদেশি নারীকে বিয়ে করলে, সেই নারী বাংলাদেশের নারী নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। তবে বাংলাদেশের কোন নারী নাগরিক বিদেশি কোন পুরুষকে বিয়ে করলে সেই বিদেশি পুরুষ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাবে না । ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়। ‘জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ’ বাস্তবায়নে বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণীত হয় ২০১৩ সালে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুর বয়স ০-১৮। শ্রম আইনে শিশুর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের বয়স কমপক্ষে ১৮। ১৪-১৮ বছর বয়সকে ধরা হয় কিশোর-কিশোরী বয়স সীমা। বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সের কিশোরের অপরাধকে কিশোর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় । বাংলাদেশে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে টঙ্গী, গাজীপুর এবং পুলেরহাট, যশোরে। একমাত্র জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র অবস্থিত কোনাবাড়ী, গাজীপুর।

উপজাতি

যে জনগোষ্ঠী আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে না পারলেও নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ করে বসবাস করছে তাদেরকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতি বলে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ক নং অনুচ্ছেদে উপজাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে । উক্ত অনুচ্ছেদ অনুসারে, 'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐহিত্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন'। সরকারি গেজেট অনুযায়ী বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা ৫০টি। আদমশুমারি ২০১১ অনুসারে, বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৮৬ হাজার (দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১০ শতাংশ) । বাংলাদেশের ৫০% উপজাতি বসবাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১২টি ।

অঞ্চল ভিত্তিক অবস্থান, ধর্ম ও উৎসব

আদিবাসী	অবস্থান, ধর্ম ও উৎসব
চাকমা	রাঙ্গামাটি (প্রধান আবাসস্থল),খাগড়াছড়ি,বান্দরবান,কক্সবাজার। ধর্ম— বৌদ্ধ। উৎসব— বৈশাখী পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান
মারমা	বান্দরবান,খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি। ধর্ম— বৌদ্ধ। উৎসব— ল্যাব্রে, বৈশাখী পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান
সাঁওতাল	দিনাজপুর,রাজশাহী,চাঁপাইনবাবগঞ্জ,নাটোর,নওগাঁ,বগুড়া,রংপুর। ধর্ম— হিন্দু ও খ্রিষ্টধর্ম। উৎসব— সোহরাই, মাঘ সিম, বাহা উৎসব (বসন্ত উৎসব), ফাগুয়া, হাড়িয়ার সিম, এর কংসিম, ঝুমুর নাচ ও ইত্যাদি
ম্রো (মুরং/মারুসা)	বান্দরবান (চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে)। ধর্ম— বৌদ্ধ,খ্রিষ্টান ও নিজস্ব ধর্ম তোরাই। উৎসব— মুৎসলোং, ফসল তোলার পর 'ছিয়াছত-প্লাই', কুমুলং

ত্রিপুরা (টিপরা)	খাগড়াছড়ি (প্রধান আবাসস্থল), রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, সিলেট, কুমিল্লা, চট্রগ্রাম, নোয়াখালী। ধর্ম— হিন্দু ধর্মালম্বী
রাখাইন	পটুয়াখালী,বরগুনা ও কক্সবাজার। ধর্ম— বৌদ্ধ। উৎসব- গৌতম বুদ্ধের জন্মবার্ষিকী, বৈশাখী পূর্ণিমা, বসন্ত উৎসব
তঞ্চঙ্গ্যা	রাঙ্গামাটি,খাগড়াছড়ি,বান্দরবন,চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার।
লুসাই	খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি
বনজোগী (বম)	রাঙ্গামাটি,খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান
চাক ও খুমি	বান্দরবান
পাংখোয়া	বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি
খাসিয়া	সুনামগঞ্জ,হবিগঞ্জ,মৌলভীবাজার ও সিলেটের জয়ন্তিকা পাহাড়ে। ধর্ম— খ্রিষ্টান । প্রধান দেবতার নাম ছিল 'উব্লাই নাংথউ'
মণিপুরি	মৌলভীবাজার (প্রধান আবাসস্থল), সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ। প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী তবে 'মৈ তৈ পাঙন' নামে একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী আছে । উৎসব—গোপী নাচ ও অন্যান্য
মুন্ডা	সিলেটের চা বাগান, যশোর এবং খুলনা
শবর	মৌলভীবাজার, সিলেট
হাজং	সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও শেরপুর
ওরাওঁ	দিনাজপুর,রংপুর,রাজশাহী ও বগুড়া। ধর্ম— প্রকৃতি উপাসক। উৎসব— ফাগুয়া, ফাগুন মাসের শেষ তারিখে পালন করা হয়

কোল	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী
রাজবংশী	রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও ময়মনসিংহ
গারো (মান্দি)	গাজীপুর,ময়মনসিংহ,শেরপুর,নেত্রকোণা,টাঙ্গাইল,জামালপুর, সুনামগঞ্জ ও সিলেট। ধর্ম—খ্রিষ্টান। আদি ধর্মের নাম— 'সাংসারেক'। উৎসব— সূর্যের প্রতীক ও জমির উর্বরতার দেবতা 'সালজং' এর সম্মানে উদযাপিত হয় 'ওয়াংগালা' উৎসব।

অন্যান্য

বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজাতি— চাকমা, দ্বিতীয়— সাঁওতাল।
গারো ও খাসিয়া মাতৃপ্রধান উপজাতি এবং অন্য সকল উপজাতি পিতৃতান্ত্রিক।
মৌলভীবাজারে বসবাসকারী পাঙন উপজাতি— ইসলাম ধর্মাবলম্বী।
খাসিয়া গ্রামগুলো 'পুঞ্জি' নামে পরিচিত।
সাঁওতালদের গ্রাম প্রধানকে 'মাজি' বলা হয়।
'বৈসাবি' পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বর্ষবরণ উৎসব।
চাকমাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান 'বিজু' পালিত হয়— ৩ দিন যাবৎ ।
পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের চাকমা, মং ও বোমাং নামক ৩টি সার্কেল রয়েছে ; সার্কেল প্রধানদের রাজা বলা হয়।
বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়— বিরিশিরি, নেত্রকোণায় ; 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি' অবস্থিত— বিরিশিরি, নেত্রকোণায়।
বাংলাদেশের উপজাতীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৩টি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রয়েছে— রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে ।
পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে শান্তি আনয়নেরে লক্ষ্যে শেখ হাসিনার সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে ; সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সাবেক চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং পাহাড়ি জনগণের পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ।